সুবল সখার কাণ্ড

"যো পদতল থল-কমল সুকোমল ধরণী পরশে উপশঙ্ক।
অব কণ্টকময় সঙ্কট বাটহি আওত যাত নিশঙ্ক॥"

—গোবিন্দদাস

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন
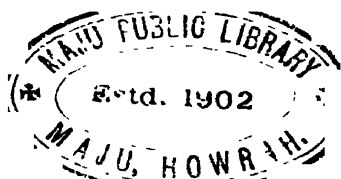
জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯

মূল্য ১৵০ আনা

যাঁহার অনুগ্রহে
বৈষ্ণব-সাহিত্য চর্চ্চার জন্য
বিশ্ববিদ্যালয়ের তোরণ
উন্মুক্ত হইয়াছে,
সেই ভারত-পূজ্য
স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
মহাশয়ের কর-কমলে
এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি
উৎসর্গ করিলাম.
গ্রন্থকার

উপহার

শ্রীহরি

ভূমিকা

বৈষ্ণবের শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য্য এই ভাব-পঞ্চকের মধ্যে প্রবেশ না থাক্‌লে বৈষ্ণব আখ্যানগুলি ভাল বোঝা যাবে না।

প্রথম হচ্ছে শান্তভাব। কোন একটা জমিতে ফসল তৈরী কর্‌তে হ'লে প্রথম সেই জমির আগাছা-গুলি তুলে ফেলা দরকার। পতিত জমিতে কত গাছের শেকড় ঢুকে পড়েছে—তারা হয়ত ভুঁইএর ৪।৫ হাত নীচে আড্ডা ক'রে বসেছে, তা' ছাড়া কত যে গুল্মলতা, কাঁটার বনে জমিটাকে এঁটে বেঁধে ফেলেছে, তার সীমা সংখ্যা নাই। এই সমস্ত তুলে ফেলে, জঞ্জাল পরিষ্কার কর্‌তে পার্‌লে তবে ভাল গাছের বীজ বপন করা যেতে পার্‌বে। সাধকের প্রথম চেষ্টা মনরূপ জমীটাকে এই ভাবে তৈরী করা। প্রথমতঃ ভগবানের নাম জপ কর্‌তে গেলে দেখা যাবে কত জঞ্জাল ঢুকে সমস্ত মনটা দখল ক'রে বসেছে। যোগের প্রথম চেষ্টা এই মনঃসংযম।

বুদ্ধদেবের অষ্টমার্গ, খ্রীষ্টের দ্বাদশ অনুজ্ঞা—এগুলির উদ্দেশ্য হচ্ছে, সংস্কার হ'তে মনকে মুক্তি দেওয়া। মনকে শান্ত-সমাহিত করার চেষ্টা অতি দুরূহ; কোন এক কেন্দ্রে মনকে আবদ্ধ রাখ্‌তে গেলে দেখা যাবে—সংস্কারের শক্তি কি প্রবল! মহাযান বৌদ্ধ মনকে "শূন্যে" আবদ্ধ করতে চেষ্টা পান, বৈষ্ণবেরা নামজপ দ্বারা সেই সাধনা করেন। নামজপ ও শূন্যবাদ প্রায় একই জিনিষ। সাংসারিক সমস্ত চিন্তা দূর ক'রে একটা কেন্দ্রে মনকে টেনে নেওয়া, সেই কেন্দ্র 'শূন্য' (zero) হউক বা 'নাম' হউক, কিছু আসে যায় না। অর্থাৎ মনটাকে এমনই তৈরী করতে হবে, যে যখন তখন সাংসারিক সমস্ত চিন্তা ঠেলে ফেলে সে একটা জায়গায় গিয়ে স্থির হ'তে পারে। যাঁহারা জপ করেন, তারা জানেন এ কাজ কত শক্ত। নাম জপ করার সময় পৃথিবীর দুশ্চিন্তাগুলি যেন দলবল বেঁধে জোর করে মনে প্রবেশ করতে চায়। হয়ত হরির নাম জপ করা হচ্ছে, কিন্তু মনটা চ'লে গেছে রান্নাঘরে ব্যানুনের ঝোলের উপর, বিদেশ গত অসুস্থ ছেলের রোগ-শয্যার পাশে, কোন মকর্দ্দমার তদ্বিরে,—বাজারে জিনিষ কিনতে কিম্বা কোন বড় লোকের কুৎসায়—এইরূপ শত শত বিঘ্ন দূর ক'রে জপ বা যোগের দ্বারা মনকে শান্ত করতে হবে। এই শান্তির আদর্শ হচ্ছেন বুদ্ধদেব, এবং মুনি ঋষিরা।

বৈষ্ণবেরা সেই সব মহাত্মাদের জন্য তাঁহাদের ভাব রাজ্যের প্রথম সোপানে এই একটা জায়গা রেখেছেন।

দ্বিতীয় দাস্য। আকাশের মেঘ কেটে গেছে, মন শান্তি-লাভ করেছে, যখন তখন দুশ্চিন্তা তাড়িয়ে দিয়ে মন শান্তভাব ধারণ কর্‌তে পারে,—জমীর জঞ্জাল দূর হয়েছে; আগাছা আর নাই, মাটীতে অন্য কোন গাছের শেকড় নাই, এখন বীজ বপন কর্‌বার সময় হয়েছে। সাধক এই অবস্থায় ভগবানে সঙ্গে একটা সম্বন্ধের বীজ বপন কর্‌তে উৎসুক—প্রথম সম্বন্ধ দাস্যভাব। তুমি প্রভু, আমি দাস,—এই সংসার কর্ম্মভূমি, তুমি আমাকে এখানে কাজ কর্‌তে পাঠিয়েছ, তোমার কাজ কর্‌তে পার্‌লে আমি পুরস্কারের দাবী কর্‌ব। এই অবস্থায় নীতিজ্ঞান খুব প্রবল হয়, এটা করা উচিত, ওটা করতে নাই, ইত্যাদি। দাস্যভাবের মধ্যে শান্তভাব আছে—আর এই প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধটুকু বেশী আছে। খ্রীষ্টানেরা ভাবরাজ্যের এই জায়গাটায় আছেন, ভগবানকে তাঁহারা পিতা বলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার সঙ্গে তাঁহাদের এই প্রভু ভৃত্য সম্বন্ধ।

তৃতীয় অবস্থায় সখ্যভাব,—আমি তোমাকে আরও একটু কাছে চাই, প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক হইতে মন আরও একটু অন্তরঙ্গতা বেশী চায়; হে সখা, আমি তোমার সঙ্গে খেল্‌ব,—এই জগত—তোমার লীলার নিকেতন, এখানে

সকলেই আমার খেলার সাথী। এই জায়গাটায় এলে কর্ম্ম-ক্ষেত্র লীলাক্ষেত্র হয়ে পড়ে। তখনকার কথা হচ্ছে হে প্রধান খেলোয়ার, তোমাকে না চিন্‌লে আমি অপর কাউকে চিন্‌তে পারি না, তাদের সঙ্গে খেল্‌তে পারি না,—এই খেলার মাঠে তুমি আমাদের আশ্রয়, এবং ঘনিষ্টতম খেরু। বিপদে পড়লে আমি নিজে বিপদ নিবারণ করতে পার্‌ব না, আমি তোমার উপর ভার দিয়ে রেখেছি, আমি জানি শুধু তোমায়; আমার বিপদ দুঃখের খবর আমি জানি না, সে সকল খবর তুমি রাখ্‌বে, আমি তোমায় নিয়ে থাক্‌ব, —আমার ভার তোমার উপর দিয়ে, আমি নিশ্চিন্ত হয়ে তোমার সাথে খেল্‌ব—পৃথিবীর সব্বাই আমার খেলার সাথী—এই স্থান সেই নিত্য-লীলার ভূমি। বাঘ আসুক, সাপ আসুক, শিশু যেমন মায়ের আঁচলের কাছে থাক্‌লে সে একবারে নিশ্চিন্ত হয়, সেইরূপ অঘাসুর, বকাসুর, কালীয়নাগকে আমরা ভয় করি না—কারণ আমি তোমায় পরম আশ্রয়রূপে জেনেছি, তোমারই খেলার আনন্দে বিভোর হ'য়ে আছি। এই সখ্যভাবের মধ্যে সেবা আছে, কারণ সখারা কানুকে কাঁধে ক'রে নিয়ে যাচ্ছে, কখন বা রৌদ্রের সময় হাওয়া কচ্ছে, ফল কুড়িয়ে খেতে দিচ্ছে, সুতরাং দাস্য ভাবটি এখানে পূর্ণ মাত্রায় আছে। কিন্তু তার চাইতে একটু বেশী আছে,—তারাও

কাণুর কাঁধে চড়্‌ছে, তার কুড়ণো ফল খাচ্ছে,—ভগবান আর একটু ঘনিষ্ট হ'য়ে দেখা দিয়েছেন। শান্ত ও দাস্য এই দুটি ভাবকে আত্মসাৎ ক'রে সখ্যভাব, ভগবানের প্রতি ভক্তির রাজ্যে আরও একটু এগিয়ে এসেছে।

চতুর্থ বাৎসল্য,—এটা ছেলেদের পিতৃমাতৃ ভক্তি নহে, সেটি হচ্ছে দাস্যভাব, ছেলে মা বাপের সেবা করে কর্ত্তব্য-জ্ঞানে, কিন্তু বৈষ্ণবদের ঊর্দ্ধতন ভাব-রাজ্যে কর্ত্তব্যের এলাকা নাই, সেটা আনন্দের রাজ্য, রসের রাজ্য।

ছেলের মধ্যে ভগবানকে আবিষ্কার করা হচ্ছে বৈষ্ণব-দের বাৎসল্য ভাবে। যে শিশু আতুর ঘরে প্রথম দেখা দিলে, তার চাইতে আশ্চর্য্য—তার চাইতে চমৎকার জিনিষ কোথায়? বেনে তার সোনার থলি ভুলে যায়, এমনই সে ধন। বাঘ, যার নিষ্ঠুরতা প্রবাদ-কথার ন্যায়, সেই বাঘও যখন তার সদ্যঃজাত শাবকটি দেখে, তখন তার চোখের ভাব অন্য রকম হ'য়ে যায়, সমস্ত মাতৃ-করুণা সেই চোখের উপর আসন ক'রে বসে। শিশু দেখ্‌তে সুশ্রী কি কুশ্রী হ'ক, কিছুমাত্র আসে যায় না, পিতামাতার নিকট সে যেরূপে দেখা দেয়, তার মত সুন্দর ও চমৎকার আর কিছু হ'তে পারে না। এই শিশুর প্রতি মায়ের স্নেহ, শুদ্ধ রসের উৎস স্বরূপ, আনন্দ লোকের জিনিষ, স্বর্গীয়, অপার্থিব, অ-পূর্ব্ব। পৃথিবীটা তো রোজ রোজই

পুরাতন হয়ে যাচ্ছে. পাতাগুলি শুকনো হয়ে ঝরে পড়ছে গাছ থেকে, ফুলগুলি একরাত্রির পরেই বাসি হয়ে যাচ্ছে। এই গলিত কেশ, পলিতদন্ত বৃদ্ধ পৃথিবীর মোহিনী শক্তি কোথায়? ঐ শিশুইতো পৃথিবীকে নিত্য নূতন করে করে দেখাচ্ছে। এই নূতন অতিথিটি রোজ রোজ ভোরের গান, সদ্যফোটা পদ্মের পরিমল, গোলাপ-কোরকের লালিমা নিয়ে নূতন আনন্দের সংবাদ নিয়ে আসছে। পৃথিবী পুরাণো হয়ে যায় নাই--মৃত্যু দাঁত বের করে ভয় দেখাচ্ছে বলে পৃথিবীর জীবন ক্ষয় হয় নাই, এই আনন্দের বার্ত্তা দিচ্ছে। বৈষ্ণবগণ শিশুর মধ্যে ভগবৎসত্বার আবিষ্কার করেছেন। বাৎসল্যে দাস্য আছে, মায়ের মত সেবা কে করতে জানে? কর্ত্তব্য বুদ্ধিতে এ সেবা হয় না, সে সেবাতে মন ও দেহকে ক্লান্ত করে, কিন্তু মায়ের সেবা আনন্দের প্রেরণায়, তাহাতে ক্লান্তি নাই, অপরিসীম সেবায় অপরিসীম আনন্দ, সেই আনন্দই তার পুরস্কার—অন্য পুরস্কার মা চান না। বাৎসল্যে সখ্যভাবও আছে, রোমের কোন সম্রাটকে ভিন্ন দেশের এক রাজদূত দেখতে এসেছিল, ঘরে ঢুকে দেখলে রাজা ঘোড়া হয়ে নিজের ছেলেটিকে পিঠে নিয়ে দৌড়াচ্ছেন, ছেলের সঙ্গে সখ্য স্থাপন ক'রে পিতামাতা শিশুর সঙ্গে তারই মত কত প্রলাপ বক্তে থাকেন,—শিশুর কথায় যেমন অর্থ নেই, ছেলে-

ভুলানো ছড়ারও সেরূপ অর্থ নাই, তাহা মা বাপের সেই সখ্যের পরিচয় দিয়ে থাকে। দাস্য ও সখ্য ছাড়া বাৎসল্যে আরও একটা কিছু বেশী আছে যাতে ক'রে আনন্দের মাত্রা এই জায়গায় আরো ঢের বেড়ে গেছে।

বাৎসল্যের পরে মাধুর্য্য। মাধুর্য্যে দাস্য আছে, প্রেমের সেবার মত সম্পূর্ণ সেবা কোথায়? নিজের অস্তিত্ব ভুলে গিয়ে সেই সেবা। মরা মানুষকে ভেলা ক'রে, কালসাপকে দড়ি বানিয়ে যে সেবা তার তুলনা কোথায়? প্রেমের মধ্যে সখ্য আছে—সেই 'অবিদিত গত যামা' রাত্রিতে পরস্পরের গলায় গলায় ভাব—সখ্যের চূড়ান্ত,—এই ভাবের মধ্যে বাৎসল্য আছে, নিদ্রিতের মুখ দেখে যে আনন্দ হয়, কোন্ জননীর আনন্দ তার চাইতে বেশী? প্রেমিক-প্রেমিকা যে সকল প্রলাপ কথা ব'লে থাকেন, কোন্ জননী তার শিশুর সঙ্গে তার চাইতে বেশী প্রলাপ বকেছেন? কিন্তু এ ছাড়া মাধুর্য্যে আর একটা ভাব আছে, সমস্ত বিশ্ব প্রেমের চক্ষে উদ্দিষ্টের স্মারক চিহ্নের মত দেখায়। মেঘ ও বায়ু সেই প্রেমবার্ত্তার বার্ত্তাবহ হয়। ফুল, চন্দ্র, কোকিলের স্বর,—বিশ্বের সমস্ত সংগীত ও ছন্দ সেই প্রেমের স্মৃতি-চিহ্ন—মাধুর্য্যের উৎস হ'য়ে দাঁড়ায়। দ্বিতীয় ছেলেটি হ'লে মায়ের অনুরাগ সদ্যঃজাতের প্রতি অধিকতর হয়, ছেলে মারা গেলে অপর ছেলে কোলে ক'রে মা

হারানো ধনটি ক্রমে ভুলে যান, কিন্তু মাধুর্য্যের জগতে "একোমেবাদ্বিতীয়ং" কেউ জ্বলন্ত চিতানলে হেসে হেসে প্রাণ দিচ্ছে, কেউ আরাধনার ঘিয়ের বাতি জ্বেলে সারাটা জীবন প্রিয়ের ধ্যানে কাটিয়ে দিচ্ছে।

প্রথমতঃ ভূমি চষে ফেলে তৈরী ক'রে. তার পর ভৃত্যের বাহির ঘর গঠন করে, তার পর খেলার আঙ্গিনা তৈরী ক'রে শেষে অন্তঃপুরের পথে শিশুর শয্যাপার্শ্বে—তার পরে একবারে, রুদ্ধদ্বার বাসর ঘরে, সেখানে বাহিরের কারু প্রবোশাধিকার নাই। এই জন্য রামরায় যখন মাধুর্য্যের গূঢ় কথা মহাপ্রভুকে বল্‌তে চেয়ে ছিলেন মহাপ্রভু তখন নিজ পদ্মহস্তে রামরায়ের মুখ চেপে ধরেছিলেন। যে কথা অপূর্ব্ব হ'তেও অপূর্ব্ব সে কথা বল্‌বার নহে, এজন্য মহাপ্রভু তাঁহাকে সে কথা বল্‌তে দেন নাই।

এই পঞ্চ ভাবের আভাস আমার বৈষ্ণব আখ্যান গুলিতে দিতে চেষ্টা করেছি। বলা বাহুল্য এই পুস্তকের অনেক কথাই আমি বৈষ্ণব পদ হ'তে নিয়েছি, আমার সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ঋণ চণ্ডীদাসের কাছে।

উপসংহার করার পূর্ব্বে আমি আর একটি কথা বল্‌তে চাই। চণ্ডীদাসের আখ্যানে গুরুবাদটি খুব জোর দিয়ে প্রচার করা হয়েছে। রাধা সুবল কৃত অভিনয়ে কৃষ্ণ-রূপের আভাস মাত্র দেখ্‌তে পেয়েছিলেন; তাঁর

কৃষ্ণদর্শনের লোভ হয়েছিল। কিন্তু সুবলের নিকট কৃষ্ণমন্ত্র পাওয়ার পূর্ব্বে তিনি কৃষ্ণ দর্শন পান নাই।

৭নং বিশ্বকোষ লেন,
বাগবাজার, কলিকাতা,
২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯২২।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

সুবল সখার কাণ্ড

বিমনা
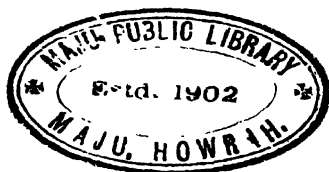
ধবলী গরু হারিয়ে গেছে। বৃন্দাবনের জঙ্গল খুঁজে খুঁজে কৃষ্ণ হয়রান হোয়েছেন, এবারও কি ব্রহ্মা ছল করে কৃষ্ণকে পরীক্ষা কচ্ছেন ?

কোথাও তো নেই ; পাঁচন বাড়ী দিয়ে লতাপাতা ভেঙ্গেচুরে খুঁজচ্ছেন, গিরিগোবর্দ্ধন, নন্দালয়, বংশীবট, দ্বাদশবন—সমস্ত খুঁজে শেষে অপরাহ্ণে কৃষ্ণ গরুটি যাবটে একটা গাছতলায় শোওয়া অবস্থায় দেখ্‌তে পেলেন ; সে বেচারীও পথ খুঁজে পায়নি ঘাসটাস খাওয়া ছেড়ে দিয়ে সেও শ্যামরূপের সন্ধান করে উর্দ্ধপুচ্ছ হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে। পশু হোলে কি হয়, সে তার ঠাকুর চিন্‌ত। এখন কৃষ্ণের পায়ের শব্দে তার রোমাঞ্চ

হ'ল, সে ফিরে কৃষ্ণকে দেখে এমনি ভাবে ছুটে এল ও কৃষ্ণকে ঘ্রাণ করে শব্দ কর্‌তে লাগ্‌ল যেন মনে হ'ল সে পশুজগতের রাজা হোয়ে গেছে।

কৃষ্ণ ধবলীকে লয়ে পাঁচন বাড়ীটা হাতে ফিরে এলেন ; কিন্তু রাখালেরা দেখ্‌ল তার মূর্ত্তি বিষণ্ণ। কৃষ্ণের সদা হাস্যময় মুখ, যা' দেখে রাখালেরা প্রাণ পায়—স্ফূর্ত্তি পায়, আজ সে মুখ কাঁদ কাঁদ। "হ্যাঁরে কানু কি হোয়েছে বল্‌ না ?" ব'লে জনে জনে শুধাতে লাগ্‌ল। "কিছু না।" ব'লে কৃষ্ণ সে সকল প্রশ্ন এড়িয়ে চল্লেন। সুদাম বল্লে, "কংশের কোনো চরের সন্ধান পেয়ে থাক্‌বে ? আমার বড্ড ভয় হচ্ছে।" মধুমঙ্গল— "তাই বুঝি ও বসে বসে জপ্‌বে ! সে ছেলেই ও নয় ! খেল্‌তে খেল্‌তে কত বড় বড় অঘাসুর, বকাসুর মেরে ফেল্লে ! ওর মুখ ভার কেন কে জানে ?" বসুদাম বল্লে—"ভাই, ওর মুখ অমন দেখ্‌লে আমার কিছু ভাল লাগে না, ও যদি কাল

ওমন করে থাকে, কথা না বলে, তবে আমি জলে ঝাঁপিয়ে প্রাণ দেবো।” এই বলে সে কেঁদে ফেল্ল; আর আর রাখালেরা স্তব্ধ হ'য়ে ছবির মত দাঁড়িয়ে রইল, কেহ ভরসা করে তাকে সান্ত্বনা দিতে গেল না, তাদেরও চোখের জল ঠেলে উঠ্ছিল। একজন বল্লে, “চ, না বলাইদার কাছে যেয়ে বলি, ওর কাছে তো আর কানু কিছু গোপন কর্তে পার্বে না, না হয় আমাদেরই এড়াচ্ছে!” সুদাম তার ধরার আঁচলটা দুই হাত দিয়ে ধ'রে ভেজা চোখ দুটি নত ক'রে বল্লে—“কে যাবে বলাইদার কাছে? ওই কদম গাছটার নীচে দুটো চোখ লাল করে ব'সে আছে, যে মারে!” এমন সময় কৃষ্ণ হাস্তে হাস্তে এসে বল্লেন—“কিরে তোরা বড্ড জটলা পাকাচ্ছিস! আয়, খেলবি আয়, বসু, তুই আমার ঘাড়ে চড়ে বস্।” বসু এসে লাফিয়ে ঘাড়ে উঠ্ল—কৃষ্ণ তাকে নিয়ে দে ছুট! তখন মেঘ কেটে গেলে যেমন রোদ্ হেসে ওঠে, রাখালদের মুখ তেমনি

প্রসন্ন হোয়ে উঠ্‌ল। তারা কেউ "কানামাছি", কেউ "চোর ধরা" খেলা খেল্‌তে লাগ্‌ল। বা কেউ বালুর সিংহাসন গড়ে রাজা হোয়ে বিচার কর্‌তে বসে গেল, আদালত খুব জমে উঠ্‌ল, কেউ বা পাইক সেপাই হোয়ে হাঁক্‌তে লাগ্‌ল। কেউ বা বালুর উপর নিজের ছায়া পড়্‌ছে দেখে, হাত দিয়ে সেটাকে মুছে ফেল্‌তে চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌ল, কিছুতেই না পেরে ছায়াটার উপর দুই কিল মেরে খিল খিল করে হেসে উঠ্‌ল।

পর দিন কৃষ্ণ গোঠে এলেন না, অনেক বলে কয়ে সখাদের কাছে একদিনের ছুটির মঞ্জুরী নিলেন। কেবল সকলের খাওয়ার সময় সুবল সখার ধড়ার কোঁচাটা ধরে টেনে রেখে তার কানে কানে বলে দিলেন, যমুনার পাড়ে মাধবী-তলায় যেন সে তার জন্যে অপেক্ষা করে, সে স্থানটি বড্ড নির্জ্জন।

"ভাই, আর হাসি খেলায় আমার প্রাণ নাই।" [৫ পৃঃ

Lakshmibilas Press.

মনের কথা ভেঙ্গে বলা

কৃষ্ণ যথা সময়ে সেই মাধবী-তলায় এসে সুবল সখার সঙ্গে মিলিত হোলেন। সুবলকে কৃষ্ণ বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরে' তার মুখের দিকে ছল ছল চোখে চেয়ে রইলেন। সুবল অবাক্ হোয়ে তার চোখ মুছিয়ে বল্লেন, "কানু তোর কি হোয়েছে? তোর ব্যথা যা থাকুক—রাখালেরা সবাই তোর জন্যে প্রাণ দিতে পারে, তুই বল্ না কি হয়েছে, ভাই কি কর্তে হবে, বল্ না।" কৃষ্ণ অতি মিনতিপূর্ণ চোখে বল্লেন,—"সুবল আমি সইতে পারি না, কাল সারা রাত্রি ভেবেছি, একথা তোকে ছাড়া আর কাউকে বল্বার নয়; রাখালেরা মনে বড় কষ্ট পায়, এজন্য কাল ছলনা কোরে তাদের সঙ্গে হেসেছি—খেলেছি, কিন্তু ভাই আর হাসি খেলায় আমার প্রাণ নাই। আমি তোর কাছে একটা মনের কথা বল্ব—

তুই যদি কোন উপায় ক'রে দিতে পারিস্—সে কথা আর কেউ যেন না শোনে।" সুবল কানুকে কত আদরে, কত স্নিগ্ধ-কথায় আশ্বাস দিলেন; —তখন ধীরে ধীরে কৃষ্ণ কইতে লাগ্লেন!—

"কাল ভোরের বেলা ধবলীকে নিয়ে যমুনার পাড়ে বেড়াচ্ছিলাম—তা কি দেখে হয়তো বা মনে কল্লে, আমি সেইদিকে যাচ্ছি, ধবলী আর এক পথ ধর্‌লো; তখন আমি একটা জামগাছের ডাল হ'তে তোদের জন্য জাম কুড়ুচ্ছিলাম,—টের পাই নি, তার পর চেয়ে দেখি ধবলী নাই, তখন জামটাম ফেলে তাকে খুঁজ্‌তে লাগ্‌লাম।"

"দেখ্‌লেম কোথাও নেই, শেষে যাবটের দিকে গেলুম,—সেই পথে ধবলীর পায়ের চিহ্ন দেখ্‌তে পেলুম, তাই ধরে ধরে বৃষভানুপুরে গিয়ে উপস্থিত হলুম, তখন দুপুর বেলা,—রাজবাড়ীর কাছে একটা পুকুর পাড়ে ধবলীকে দেখ্‌তে পেলুম।"

"হঠাৎ শুনলুম যেন কেউ মৌচাক্ ভাঙ্গছে।

চেয়ে দেখ্‌লুম কয়েকটি সখীর সাথে একটী কুমারী আস্‌ছেন, তাদের পায়ের নূপুর রুণুঝুণু বাজ্‌ছে।”

“সেই কুমারীর কথা কি বল্‌ব! তার বর্ণ চাঁপা ফুলের মত, সইদের সাথে জড়াজড়ি করে খেলা কচ্ছিলেন, তার পর পুকুরের একটা ধাপে বস্‌লেন, সখীরা তাঁর গা খুলে আমলকী দিয়ে ধুইয়ে দিল, তিনি আঁচল খানির উপর বসে এক পায়ের উপর আর এক পা রেখে গা মাজ্‌ছিলেন; পিঠে একটা বেণী তুল্‌ছিল। সখীরা তা ঘটা করে বসে খুলে ফেল্ল। আমি ভাল করে দেখ্‌তে পেলুম না, এমন সুন্দর মুখ তো ভাই আমি কোথায়েও দেখি নি?”

সুবল—“তুই কি গাইটা নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছিলি।”

কৃষ্ণ—“প্রথমতঃ তাই কচ্ছিলুম, কিন্তু শেষে কেমন বাধ বাধ ঠেক্‌ল, তখন ধবলীকে ধীরে ধীরে হাঁটিয়ে নিয়ে একটা অশ্বত্থগাছের পেছনে

দাঁড়ালুম ; সেখানে মস্ত বড় বন-লতা, তার আড়াল থেকে সেই লতার মধ্যে তুটি চোখ রেখে দেখ্‌ছিলুম—সে কি রূপ ভাই, যেন মেঘ হোতে বিত্যুৎ এসে আমার বুকে শেলের মত বিঁধ্‌ল।"

"তার পর সেই কুমারী স্নান করে উঠে হেসে হেসে সইদের সঙ্গে কথা কইতে কইতে পুরীর দিকে চলে গেলেন ; তার ভেজা চুল থেকে বিন্দু বিন্দু জল ঝড়্‌ছে ও তিনি তাঁর নীল সাড়ী তুই হাতে নিঙ্গড়িয়ে নিঙ্গড়িয়ে যাচ্ছেন, আমার হৃদয়ও যেন সেই কোমল হাতের স্পর্শে শিউরে উঠ্‌তে লাগ্‌ল—কল্পনায় ভাবলুম, আমি ত ভাই নীলচে কালো রং, আমি যদি মানুষ না হোয়ে সাড়ীখানি হতুম তবে আমার ভাগ্যেও বুঝি সেই কোমল হাতের ছোঁয়া ঘট্‌ত।"

"এর পর সেই রূপের পুষ্পবৃষ্টি কর্‌তে কর্‌তে সে চলে গেল, মনে হ'ল যে পথে সে চলে গেছে, সে পথে সে শত শত পদ্ম ফুটিয়ে দিয়ে গেছে, তা না হোলে ঝাঁক বেঁধে ভ্রমরের দল পথের

ধুলোয় পড়ে চুমো খেতে লেগে যাবে কেন?
আমি একটী পদচিহ্ন পেয়ে আস্তে তাহাতে
চুমো খেয়েছি। সে যে দিকে চলে গেল—সে
দিকে যেন একটা নীল পদ্মের মালা ভাস্‌তে
লাগ্‌ল,—তাই দেখ্‌তে দেখ্‌তে আমি বিভোর
হোয়ে চলে এসেছি। তদবধি আমার—মন-প্রাণ
সেই দিকে চলে গেছে। আমার আর খেলা
ভাল লাগ্‌ছে না—ঘর বাড়ী কিছু ভাল লাগ্‌ছে
না, সে যদি দয়া করে দেখা দেয়—যদি তার
হাসি আর একটিবার দেখায়, তবেই বাঁচ্‌তে
পারি—তা না হোলে বাঁচবার সাধ নাই।"

সুবল বল্লে—"সে বৃষভানু রাজ-কন্যা রাধা;
আচ্ছা আমায় দুটো দিন সময় দাও, আমি চেষ্টা
করে দেখি।"

কৃষ্ণ—"সেও কি সম্ভব? তাকে না পেলে
কিন্তু আমি যমুনায় ঝাঁপ দিয়ে মর্‌ব।"

সুবল—"কানাই! আমি তোর গায়ে হাত
দিয়ে শপথ কচ্ছি, আমি এই যমুনার পারে তার

সঙ্গে তোর দেখা করাব, যদি না পারি, তবে তুই একা কেন, তুই আমি দুজনেই যমুনায় পড়ে মরব।”

সখার ফন্দি

সুবল যাত্নবিদ্যায় সুনিপুণ ; সে একদিন বৃষ হোয়ে রাখালদের গরুর পালে এমনই মিশে গেছিল যে, রাখালেরা বাড়ী ফিরে গরু গুণ্‌তি করে নেওয়ার পর এই ষাঁড়টা কার কিছুতেই ঠাওর কর্ত্তে পার্‌লে না। তখন স্তোককৃষ্ণ ষাঁড়টার গলায় দড়ী বেঁধে পাড়ায় ঘুর্‌তে লাগ্‌ল ও চেঁচিয়ে বল্‌তে লাগ্‌ল—'তোমাদের কার ষাঁড় হারিয়েছে ?' কিন্তু যেই সুবলের বাড়ীর কাছে আসা, অমনি ষাঁড়টা দুইটা পা উঁচু করে দু'পায়ে দাঁড়িয়ে তার পর ঠক্ ঠক্ করে কাঠের খুর দুটোকে ফেলে দিয়ে, একটা হাতে লেজটা ও কালো কম্বলটা টান মেরে ফেলে দিলে এবং মুখোসের মধ্যে থেকে মুখখানি বের করে বল্লে—"আমি হচ্ছি, এই বাড়ীর ষাঁড়।" তখন স্তোককৃষ্ণ অবাক হোয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আর আর

রাখালেরা হাতে তালি দিয়ে সুবলকে "বাহাবা" দিল।

সুবলের বাড়ীতে নানারূপ কাঠের সাজ, মুখোস ও বাদ্য-যন্ত্র মজুত ছিল। সে নিজে এমনই সাজ্‌তে জানত, সে যখন যার বেশ পরে বের হোত, তখন তাকে ঠিক তার মতই দেখাত।

সে এবং আর চারজন রাখাল, একত্র হোয়ে কয়েকটা মুটের মাথায় তাদের কাঠের সাজ, মুখোস ও পোষাক পরিচ্ছদ দিয়ে—পরদিন সকাল বেলা বৃষভানুপুরে রাজবাড়ীর দরজায় এসে, ডঙ্কা মার্‌ল। তারা পাঁচজন রাখাল—সুবল, মধুমঙ্গল, স্তোককৃষ্ণ, ত্রিবিট ও মদন।

ডঙ্কা শুনে রাজদ্বারী এসে "কি চাও" বলে হেঁকে উঠ্‌ল। সুদাম বল্লে—"আমরা গুণী, নানা রূপ খেলা দেখাতে জানি। রাজাকে খেলা দেখাতে এসেছি।"

দ্বারী ফিরে এসে রাজার আজ্ঞাক্রমে সুবল ও সঙ্গীদের রাজ-দরবারে হাজির করে দিল।

রাজা খেলা দেখ্‌তে রাজী হোলেন। নহবৎ বাজ্‌তে সুরু হ'ল; আঙ্গিণাটা রাঙ্গা-পাটের পাছুড়ি দিয়ে ঢেকে দেওয়া হ'ল। রাজা প্রজা—সকলে যে যার আসন গ্রহণ কল্লেন, সমস্ত নগরময় ঢেরা পিটিয়ে দেওয়া হোয়েছিল, বহুলোক রাজবাড়ীর উৎসব দেখ্‌তে এল। সেই সুবিস্তৃত আসরের একটা দিকে একটা মঞ্চ উত্থিত হোয়েছিল, তার উপর বালকেরা যেয়ে তাদের যন্ত্রপাতি শুদ্ধ আড্ডা নিলে।

বিশাল রাজপুরীর উপরকার বারণ্ডায় ঝারোকা, সেই খানে বৃষভানুপত্নী কৃত্তিকা দেবী বসেছেন, পার্শ্বে "ঢল ঢল অঙ্গের লাবনী" রাধা রূপমঞ্জরীর কাঁধে দেহ-লতাটি হেলিয়ে, বাজিকর-দের অপূর্ব্ব বেশ-ভূষা সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাসা করছেন। এক সখী তার মুখে চামর দোলাচ্ছেন, তার কয়েক গাছা চুল ভ্রমরের মত যেন সেই হাওয়ায় তাড়া খেয়ে উড়ে উড়ে মুখের উপর বস্‌ছে, কস্তুরিকা স্বর্ণভৃঙ্গ হাত করে কৃত্তিকা-

দেবীর চরণ পার্শ্বে বসে আছে। রাধা রূপমঞ্জুরীকে জিজ্ঞাসা কচ্ছেন, ঐ ছেলেটী বড্ড দেখ্‌তে সুন্দর, কিন্তু মুখখানায় মেয়েলী ভাব,—ঐ দেখ্‌ছ না, সাজবার ঘরে পরচুলা হাতে নিয়ে একটি লম্বাপানা ছেলের সঙ্গে মুখভঙ্গী ক'রে কি কইছে!" রূপমঞ্জুরী বল্লে, 'ওইত হচ্ছে ওদের ওস্তাদজী, ওই নাকি সব্বার চাইতে ভালো খেলোয়ার।" রাধা—"এই সকল ছেলে ছোক্‌রা ওস্তাদ বাবা পেলেন কোথায়? এরাই নাকি আবার খেলা দেখাবে? তা ভাই এঁরা ৪।৫ জন মিলে এসে যদি আসরে দাঁড়ায় তবেই মন্দ শোভা হয় কি? আমার মনে হচ্ছে যেন এঁদের গায়ে মাঠের ফুলের গন্ধ এখনও আছে,—কোন্ মাঠ থেকে ছেলে গুলো এসেছে? রাজপুরীর ছেলেদের মত ইচোঁরে পাকা আদৌ দেখাচ্ছে না—পাড়াগাঁ যেন তার আদরের হাত এদের মুখে বুলিয়ে দিয়েছে। আমার ভাই এদেরে দেখ্‌তে কেমন ভাল লাগ্‌ছে—ঐ ছাখ সাজবার ঘরের দোরটা বন্ধ করে দিল।"

রূপমঞ্জুরী—“ঐ সুবল ছোঁড়াটা এমনই একটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়েছিল—যেন আমার মনে হ’ল এই ঝারোকা ভেদ করে শরের মত তার দৃষ্টিটা আমাদের মুখের দিকে পড়্‌ল—আমরা তাদের নিয়ে কথাবার্ত্তা কইছি, বুঝতে পেরে সে দোর বন্ধ করে দিচ্ছে—আর এখন তো ওরা সাজ্‌বে—দোর খোলা রেখে তো আর সাজ্‌তে পারে না।”

বিচিত্র খেলা

এইবার ঘণ্টা পড়্‌ল। তখন ছেলেরা রাম-বনবাস পালা অভিনয় করে দেখাল। পাঁচটী মাত্র ছেলে, কিন্তু এরা ঘুরে ফিরে কে কখন কৌশল্যা হ'ল, মন্থরা হ'ল, সুমন্ত্রী সারথী সেজে রথ চালাল —এতদূর দ্রুততার সহিত বেশ পরিবর্ত্তন করে ফেল্ল, ও নূতন নূতন দৃশ্য চোখের সাম্‌নে উপস্থিত কল্ল—যে কি রকম করে যে কি হয়ে গেল, তা' কেউ বুঝল না—এক ঘণ্টার মধ্যে পালা সাবার, কেবল দর্শকেরা যেন একটা মহা-শোকের মধ্যে পড়ে ধরফর কর্‌তে লাগ্‌ল, হঠাৎ রাজপুরীর কপাট বন্ধ—রাজশ্রী কোথায় চলে গেছে, সমস্ত অযোধ্যা যেন তার হাতের কাঁকন, পায়ের মল ও গলার হার ফেলে দিয়ে ধূসর পৃথিবীর উপর পড়ে লুটাপুটি খেতে লাগ্‌ল—যেন বসন্তের হাওয়ার মত তিনটী প্রাণী রাজ্যের যা কিছু সুখ

—'তা নিয়ে নিজেরা যোগীর বেশ ধরে চলে গেল—দাব-দগ্ধ মৃত্তিকার মত পুরী পাণ্ডুর বর্ণ হোয়ে কাঁদতে লাগ্‌ল। দর্শকদের মধ্যে সকলের চক্ষু একটী অভিনেতাকেই বিশেষরূপে লক্ষ্য কর্‌ল, সে যখন যে মূর্ত্তি ধরে এল, তাহাতেই কেবল "চমৎকার" "বাহাবা" শব্দ ঘন ঘন উত্থিত হ'ল; তাদের অভিনয়ে ত্রেতা যুগের স্বপ্ন যেন সকলের সাম্‌নে জীবন্ত হোয়ে উঠ্‌ল। অভিনয়ান্তে বৃষভানু রাজা সুবলকে আলিঙ্গন দিতে গেলেন; সভাসদেরা, সমস্ত যাবটবাসীরা নানা রূপ মাল্য চন্দন ও গন্ধ-দ্রব্য উপহার দিতে গেলেন; সুবল মঞ্চের সাম্‌নে এসে নমস্কার কোরে বল্লে,—আপনারা আরও খানিকক্ষণ অপেক্ষা করুন—পুরস্কার যা' হয় পরে দেবেন, আরও দেখাবার আছে। তখন মহা কৌতূহলের সঙ্গে পুনরায় যে যার স্থান অধিকার কোরে বস্‌লেন। তখন সহসা গভীর গর্জ্জন কর্‌তে কর্‌তে এক বিরাট বরাহ মঞ্চে এসে দাঁড়াল, তার

দন্তাগ্রে সোণার অক্ষরে লেখা 'পৃথিবী'। সেই বরাহ শুধু মস্ত বড় নয়, তার শব্দে সমস্ত রাজপুরী থর থর করে কেঁপে উঠ্‌ল, তার বর্ণ কি ভয়ানক! যেন গভীর অমাবশ্যার আঁধার। কিন্তু সেই বর্ণের দীপ্তি ভয়াবহ হোয়েও যেন মধুর। দর্শকগণ বিস্ময়ে সেই বরাহকে প্রণাম করে উঠ্‌ল; তার পর হল হাতে এক বিপুলকায় পুরুষ, শ্বেত-পদ্মের মত তার মুখখানি সুন্দর; পরশু হাতে এক দীর্ঘকায় যোদ্ধা, তার কণ্ঠে লম্ববান পৈতা, কিন্তু ভ্রূকুঞ্চিত—যেন-জ্বলন্ত ক্ষাত্রেয় তেজ বেরুচ্ছে—কখনও বা এক বিরাট সভায় এক তেজস্বিনী রমণীর অঞ্চল ধরে কোন ক্রূর-কর্ম্মা সৈনিক আকর্ষণ কচ্ছে। কেউ হেঁট মুখে বসে আছে, কেউ রোষদীপ্ত চোখে চেয়ে যেন সৈনিককে ভস্ম করে ফেল্‌ছে, কেউ রাজবেশ পরে সেই কাণ্ড দেখে হাস্‌ছে, কিন্তু সেই অসহায়া রমণীকে রক্ষা কর্‌বার জন্য একখানি হাতও সেই বিরাট সভায় উঠ্‌ছে না। সমস্ত সভা

ছবির মত স্থির হোয়ে ব'সে সেই অপমান দেখ্‌ছে।

সুবল একাই একশ', মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে সেই রঙ্গমঞ্চে নতুন নতুন খেলা! সকলের চোখ যেন উড়্‌তে উদ্যত! এ কৌতূহলের অন্ত নাই। এক এক অঙ্ক হয়ে যাচ্ছে, আর ধন্য ধন্য শব্দে আকাশ ফেটে যাচ্ছে। তার পর কখনও বৃদ্ধ ঋষি এক অপূর্ব্ব-ধামে দেবদম্পতির কাছে বীণা বাজাচ্ছেন, তাঁর দীর্ঘ শ্বেত দেহের উপর বীণাটি যেন অমৃত ভাণ্ডের মতো দেখাচ্ছে, সুর যেন নতুন নতুন রস সৃষ্টি করে দম্পতির চোখ প্রেমে ছল ছল করে দিচ্ছে, কখনও এক পঞ্চমুখ দেব নৃত্য কচ্ছেন—তাঁর নৃত্যের আবেগ সহ্য কর্‌তে না পেরে ধরণী টল মল কচ্ছে। কখনও কোন আশ্রমে এক শিশু নির্ভীক চিত্তে তাঁর মাতৃ সমক্ষে সত্য বল্‌ছেন, ঋষি সেই বালককে ব্রাহ্মণত্ব দান কচ্ছেন। কখনও কোন ভক্তের তপস্যায় প্রীত হোয়ে ব্রহ্মার কমণ্ডলু হোতে করুণারাশি নদী

হোয়ে বের হোচ্ছে ; ভক্ত শাঁখ বাজাতে বাজাতে তাকে নিয়ে যাচ্ছে—কোথাও একটা বড় পাখী নিজে পুড়ে ঝুড়ে সত্যরক্ষার জন্য সূর্য্যের রথ বোয়ে নিয়ে যাচ্ছে—এক অফুরন্ত দৃশ্যের ভাণ্ডার বালকেরা বৃষভানুপুরবাসী সকলের চোখের সামনে খুলে ধ'রে আস্তে আস্তে দৃশ্যপট সংবরণ কল্ল।

এর পর আর একটি দৃশ্য—সুবল বল্লে—"বেলা অনেক হয়েছে, আপনাদের আর একটি অভিনয় দেখাব—আর একটি মাত্র।"

শেষ দৃশ্য ও চিকিৎসা

সহসা দেখা গেল—যেন এক নদীর তীর, দূরে দূরে গরুগুলি ঘাষ খাচ্ছে—তাদের আসে পাশে রাখালেরা কেউ গাছের তলে অপরের গায়ে হেলান দিয়ে গল্প কচ্ছে; কেউ একাই বসে গান গাচ্ছে, কেউ ফুলের মালা গাঁথছে, কেউ বেণু বাজাচ্ছে, কেউ নদীর জলে মুখ ধুচ্ছে—এসকল দূরে দূরে, কিন্তু সাম্‌নে বাঁশী হাতে একজন দাঁড়িয়ে আছেন, এঁর কি রূপ—স্নিগ্ধ শ্যামবর্ণে অঞ্জনের আভা,নীলমণির জ্যোতি, নাক চোখের কি সুগড়ণ! কি চন্দন তিলক! কি পীতাম্বর! কি বনমালা—সমস্ত জগতের যা কিছু সৌন্দর্য্য, তার সার দিয়ে যেন সে মূর্ত্তি গড়া, তার পায়ে হাতে মুখে চোখে রূপের জ্যোতি খেল্‌ছে! তিনি কিছু কচ্ছেন না, শুধু দাঁড়িয়ে আছেন, হাতে বাঁশীটি নীরব, শুধু মুখের হাসিতে জগৎ ভোলাচ্ছেন।

কিন্তু এক মুহূর্ত্ত সেই মূর্ত্তি দেখিয়ে বালকেরা পটক্ষেপ করে ফেল্ল। সেই এক মুহূর্ত্তে সকলের চোখে পৃথিবীর সমস্ত জিনিষ অসার বোধ হয়েছিল, তাদের মন যেন বলে উঠেছিল—"আর কিছু চাই না, পৃথিবীর ধন মান কিছু চাই না, পুত্র কলত্র চাই না, ঐ রূপ দেখ্‌ব, আর কিছু দেখ্‌ব না—দেখ্‌তে চাই না, ঐ রূপ দেখ্‌ব।" কিন্তু সহসা মূর্ত্তি অপসৃত হোলে তারা যেন আকাশ হোতে পড়ে গেলেন। সকলের চক্ষে স্তব্ধ বিস্ময়, "একি দেখ্‌লেম!"

কিন্তু সকলেই সেই রূপের মোহ কাটিয়ে উঠ্‌লেন—এক জন উঠ্‌লেন না, তিনি সেই রূপে ডুবে গেলেন। রূপমঞ্জুরীর গায়ে হেলান দিয়ে কৃত্তিকার অঙ্কে একখানি হাত রেখে রাই অজ্ঞান হোয়ে পড়্‌লেন।

যখন সেই অভিনয়ের শেষ দৃশ্য দেখার চমক ভেঙ্গে গেল, তখন কৃত্তিকা দেখ্‌লেন রাই সংজ্ঞা-হীনা। অমনই ব্যস্তে হোয়ে উঠে আস্তে রূপমঞ্জুরীর

হাত ধ'রে টান্‌লেন; ললিতা, বিশাখা, গুণচূড়া, রঙ্গদেবী এসে উপস্থিত হলেন। রঙ্গদেবী রাইয়ের মাথায় সুগন্ধি জল নিষেক কর্‌তে লাগ্‌লেন; সুদেবী নাড়ী পরীক্ষা কর্‌তে লেগে গেলেন এবং গুণচূড়া মুখে হাত দিয়ে দেখ্‌লেন, রাইএর দাঁতি লেগে গেছে—তখন শোক ও গভীর পরিতাপসূচক একটা গুঞ্জন অন্দর মহলে শোনা যেতে লাগ্‌ল।

এমন সময়ে কৃত্তিকার দাসী মোহিনী রাইএর মহলে এসে সিংহাসনের পাছ থেকে আস্তে বৃষভানুর কানের কাছে ঝুঁকে পড়ে রাইএর কথা তাঁকে জানাল; তিনি অতিমাত্র ব্যস্ততার সঙ্গে অন্দরে প্রবেশ কর্‌লেন।

তখন সেখানে একটা হৈ চৈ পড়ে গেছে; কেউ বল্‌ছে দোয়াশনীকে ডেকে আন, কেউ তন্ত্র-মন্ত্র-সিদ্ধা আহিরিনী বুড়ীর নিকট গেল; আই-বুড়ী এসে নাড়ী টিপে বল্লে, "নাড়ী দিব্যি চল্‌ছে;" মুখ চোখ কপাল পরীক্ষা করে বল্লে, "ভূত-প্রেত-দানোয় একে পায়নি—ঠিক বল্‌তে পারি, প্রেতে

পেলে বাঁ চোখের কোলে কাল দাগ পড়্ত, ভূতে পেলে কপালের ডান দিকের শির কাঁপত, দানোয় পেলে ওষ্ঠ শুকিয়ে কাঠ হোত।" তার পর ব'সে বুড়ী অনেক মন্ত্র তন্ত্র জপ্তে সুরু করে দিল; যে সকল মন্ত্র শুন্লে তেঁতুল গাছ সর্ সর্ করে ওঠে, অমাবস্যার আঁধারে পলায়নপরা প্রেতিনীর আঁচলের ঝাপ্টা গায়ে লাগে, কন্ধ-কাটা ভয়ে শিউরে উঠে, সেই সকল মন্ত্র বিফল হ'ল। বুড়ী ঠোঁট বেঁকিয়ে বল্লে, কোন অপদেবতায় যে পায়নি তা ঠিক, এর আমি আর কি করতে পারি? নাড়ী তো বেশ চল্ছে—কোন ওষুধ বিষুধে কিছু হবে এমন মনে হচ্ছে না, যেন দিব্যি ঘুমোচ্ছে—যেন কি স্বপ্নে দেখ্ছে, একে কোন্ দেবতায় পেয়েছে—সে সন্ধান আমি রাখি না।"

তুঙ্গভদ্রা চীৎকার করে বলে উঠ্লে—"যদি সাপে কাম্ড়ে থাকে; কোথায় কাম্ড়েছে কে জানে? বুড়ী একবার ঝেড়ে দ্যাখ না—লতা-চিকিৎসা কল্লে বুঝ্তে পারি—সাপের দংশন কি

না ?" বুড়ী বল্লে—"যা'হোক কিছু বল্লেই হ'ল, সাপের কামড় হ'লে চোখ মুখ নীল হয়ে এতক্ষণ গাময় বিষের ছায়া পড়্‌ত।" আঙ্গুল দিয়ে চোখ টেনে দেখা গেল, পদ্মের পাপড়ির মধ্যে ভ্রমর যেমন ডুবে থাকে, তেমনই কি সুখের ভাবে—চোখের তারা ডুবে আছে—গায়ের রং, সকাল বেলার রোদ চাঁপার কলিতে পোড়ে যেমনই হয়, তেমনই উজ্জ্বল, প্রফুল্ল। "এঁকেও নাকি সাপে কামড়িয়েছে—তবে তোমরা বল্‌ছ—তাও করে দেখি।" এই বলে ধূনো জ্বালিয়ে বুড়ী অনেক মন্ত্র তন্ত্র পড়্‌লে—রেশমী রুমাল দিয়ে হাত মুখ কান পুছে নিলে এবং হাত পা ছুঁয়ে—নানা রূপ দেব-দেবীকে ডেকে তাঁদের সাক্ষী করে ঝাড়তে লাগ্‌ল। কিছুতেই কিছু হ'ল না। সেই বৃদ্ধা আহিরিনীর যশঃ বৃন্দাবন—মথুরায় ব্যাপ্ত ছিল; স্বয়ং কংসরাজ তার অন্দর-মহলের চিকিৎসার ভার তার উপরে দিয়া নিশ্চিন্ত থাক্‌তেন—সে যখন কিছু কর্‌তে পার্‌ল না তখন

কৃত্তিকা কেঁদে উঠ্‌লেন, বৃষভানু মাথায় হাত-দিয়ে বসে পড়্‌লেন।

দোয়াশিনীর কাছে লোক গেছিল; দোয়াশিনী মন্ত্র পড়ে তার অভীষ্ট দেববিগ্রহের মাথায় একটী রক্তজবা অর্পণ কর্‌লেন,—সেই ফুল বাঁ দিকেও পড়্‌ল না, ডানদিকেও পড়ল না, স্থির হোয়ে বিগ্রহের মাথার উপর চড়ে রইল; দোয়াশিনী কম্বল আসনে ব'সে ধ্যানস্থা হ'লেন এবং একশ' একবার নাম জপ কর্‌লেন, ফুলটি যেখানে ছিল, সেই খানেই স্থির হোয়ে রইল। তখন মন্দিরের দোরের গোড়ায় এসে তিনি রাজদূতকে বল্লেন—"রাজ-কুমারীর কোন উপকার আমার দ্বারা হবে না, রাজাকে ব'লো।"

নতুন চিকিৎসক

এদিকে রাজা যে অন্দরে ঢুকেছেন, আর বের হওয়ার নামটি নেই। বেলা বেড়ে চল্ল। অন্তঃপুর হোতে রঙ্গদেবী বের হয়ে সেই অভিনয় মঞ্চের পাশ কেটে ফুল আনবার জন্য বাগানের দিকে যাচ্ছিল, সুবল তাকে নিরালা ডেকে জিজ্ঞাসা কল্লে, "বল দেখি? ব্যাপারখানা কি? রাজা হঠাৎ বাহির মহল থেকে চলে গেলেন, আমরা তো পুরস্কার টুরস্কার কিছু পেলুম না, তা' নাই বা পেলুম, আমরা সে সকলের পেত্যাশ বড় করি না—রাজা যদি সুখী হোয়ে থাকেন তবেই যথেষ্ট; তা রাজাকে তো বোলে ক'য়ে পেন্নাম করে বিদায় নিতে হয়, তার দেখা পাবার সম্ভব আছে কি বল্‌তে পার?" রঙ্গদেবী দুঃখের স্বরে ডান হাতখানিতে কাঁকন নাড়ার শব্দ

জাগিয়ে, ঝারোকার দিকে আঙ্গুল নির্দ্দেশ করে মৃদুস্বরে বল্লে—“ভাই ব'লব কি? রাজকুমারী সেই তোমার বংশীধারী মূর্ত্তি দেখে অজ্ঞান হোয়ে পড়েছেন, কিছুতেই জ্ঞান হোচ্ছে না। কত চেষ্টা করা গেছে, কিছুতেই চোখ্ মেলে চাইছে না—একটি লোক বল্লে, সন্ধ্যা-মালতী ফুল পাঁচটী দল দেখে নিয়ে আস্‌তে, সেই ফুল পড়ে রাইএর চুল বাঁধ্‌লে জ্ঞান হবে তাই আমি বাগানের দিকে যাচ্ছি।”

সুবল বল্লে—“তুমি ফুল পড়া পরখ করে ছাখ-গে, কিন্তু রাজাকে ব'ল আমায় যদি রাজকুমারীর চিকিৎসা করতে ছ্যান, তবে আমি এমন মন্ত্র জানি যে তখ্‌খুনি রাজ-কুমারী ভাল হোয়ে যাবেন।”

রঙ্গদেবী—“সত্যি বলচ! তা হোলে রাজা তোমাদের কত পুরস্কার দেবেন! তা' ছাড়া তাঁরা যে বেঁচে যাবেন! মা কৃত্তিকা তো মেয়ের অবস্থা দেখে বিছানা নিয়েছেন, রাজার মুখ চোখ দেখলে বড় দুঃখ হয়! তোমাদের দ্বারা এমন উপকার

হ’লে রাজা তোমাদের কেনা হোয়ে থাক্‌বেন। তোমরা অনেক পুরস্কার তো পাবেই।”

সুবল বল্লে, “পুরস্কারের জন্য কোন ব্যস্ততা নেই। পরের উপকার করাই মানুষের কাজ, তা যদি হয়, তবে তাই আমাদের বড় পুরস্কার।”

“তবে যাই” ব’লে ঘোমটা টেনে রঙ্গদেবী বাগানের দিকে চলে গেল, খানিক পরে ফের্ এসে সুবলকে বল্লে—“না ফুল পড়ায় কিছু হ’ল না, রাজার আজ্ঞা, তুমি অন্দরে চল।”

চিকিৎসক না গুরু ?

সুবল যখন বৃষভানুর অন্দরমহলে ঢুক্‌ছেন—তখন তার ঘন ঘন রোমাঞ্চ হচ্ছে ; তিনি যেন মাতালের মত টলে পড়্ছেন, মনে মনে বল্‌ছেন, "আজ কানু তোর যদি কাজে লাগ্‌তে পারি, তবেই দেহ ধন্য হবে।"

বৃষভানু বল্লেন,—"এস বাছা, তুমি অনেক গুণপনা দেখিয়েছ—যদি তুমি আমার চোখের মণি রাইকে ভাল করে দিতে পার, তবে তোমার কেনা হোয়ে থাক্‌ব"।

সুবল এসে সকলকে একটু স'রে যেতে বল্লে ; ভিড় কমে গেলে সে রাধার কাণের কাছে আস্তে আস্তে কৃষ্ণ মন্ত্র জপ করতে লাগ্‌ল :—

"কাকে দেখেছিলে রাই—তা' জানো, সে কৃষ্ণ, তিনি আমাদের জীবন, জগতের জীবন, তিনি

অনিত্যের মধ্যে নিত্য—অসতের মধ্যে সৎ, তিনি আনন্দের স্বরূপ।”

“তিনি আমাদের প্রাণের অমৃত, চোখের অমৃত—তিনি রস-স্বরূপ ; রাই চোখ মেলো, সর্ব্বত্র তাঁকে দেখ্‌তে পাবে—তাকে দেখার জন্যেই তো চোখ—তাকে না দেখ্‌লে ময়ুরের পাখায় আঁকা চোখের মতো এ চোখ দিয়ে কি দরকার! এ চোখের মূল্য হয় এক কড়া।”

“কাণ পেতে শোন রাই—কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, এ নাম স্বর্গে ছিল—বড় তাপদগ্ধ এ পৃথিবী দেখে দেবতারা সেই নামের অমৃতভাণ্ড পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিয়েছেন—”

“রাই কাণ ভোরে শোন, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ”

“এ নামে মুগ্ধ হ’লে কাণ আর কিছু শুন্‌তে চাইবে না, রাই শোন কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ।”

রাইয়ের মূর্চ্ছা ভেঙ্গে গেল ; কোন্‌ দিব্য লোকে রাই যেয়ে ছায়ার মত কি দেখ্‌ছিলেন, কিন্তু কে এই কৃষ্ণ নাম তাকে এমন গুরু-মন্ত্রের

মতো কাণে দিয়ে গেল, সেই নাম কান পূর্ণ করে শোন্‌বার পিপাসা মিটিয়ে তার মর্ম্মে প্রবেশ কর্‌ল। রাই জ্ঞান লাভ করে দেখেন বেড়াজালে পড়ে যেরূপ মাছ পালাবার পথ পায় না, কৃষ্ণনাম সেইরূপ তার প্রাণকে ধরে ফেলেছে—চারিদিক হোতে যেন নারদ বীণা বাজিয়ে সেই নাম তাঁর কাণে দিয়ে গেলেন, চারিদিক ঘিরে সেই নাম তাঁকে জড়িয়ে রাখ্‌ল, সেই নাম যেন রত্ন-দুল হয়ে তার কাণে লেগে রইল, রত্নহার হোয়ে বুকের উপর দুল্‌তে লাগ্‌ল।

যখন রাই চোখ মেলে চাইলেন, তখন তার বাজিকর-শিশু-বেশী এই অপূর্ব্ব মন্ত্রগুরুকে দেখে মনে মনে প্রণাম করে, ঘোমটা টেনে মুখ ফেরালেন। সুবল রাজাকে ডেকে বল্লেন—"রাই জেগেছেন, আপনারা আসুন।" তখন নহবৎ বেজে উঠ্‌ল—মেয়েরা শাঁখ বাজাল—নকাড়া-ছকাড়া, রামশিঙ্গা খোল বেজে উঠ্‌ল, রাধিকা শুন্‌তে লাগ্‌লেন, যেন চারিদিকে নামের উৎসব

চলেছে। তাঁর চোখ্ গড়িয়ে আনন্দাশ্রু পড়্তে লাগল।
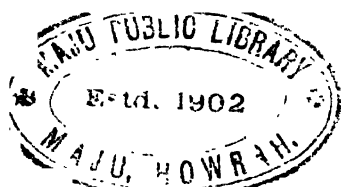
যমুন-স্নান

বৃষভানু বাহিরে এসে সুবলকে বুকে আঁক্‌ড়ে ধর্‌লেন, বল্লেন, "আজ তুমি আমার যে উপকার কল্লে, তার কৃতজ্ঞতা কি করে জানাবো!" ছেলেদের সোণার পদক, মতীর হার, হাতে কেউর, তাড়বালা, কত অলঙ্কার দিলেন—নানারূপ পট্টবস্ত্র, হীরার মালা জড়ানো পাগ, কানের কুণ্ডল উপহার দিলেন, কত সুবর্ণ ও গাভী দিলেন, তারপর কাছে বসে নানা উপাদেয় খাদ্যে পরিতৃপ্ত কর্‌লেন। এদের মধ্যে মধুমঙ্গল ছিল ব্রাহ্মণ সে ভিন্ন জায়গায় রেঁধে খেল।

সুবল বল্লে, "মহারাজ আমি আপনার উপকার করেছি বলে বারংবার লজ্জা দেবেন না;—এ অতি সামান্য কাজ। কিন্তু একটি কথা বল্‌তে চাই—রাজকুমারীর পীড়া নির্দ্দোষ হয়ে সারে নি। আবার কখনও হয়তো হঠাৎ অজ্ঞান হোয়ে

পড়্‌তে পারেন, এজন্য একটা উপদেশ দিয়ে যাব।”

আবার রাধার পীড়া দেখা দিতে পারে আশঙ্কায় রাজার মুখ শুকিয়ে গেল। তিনি আগ্রহের সঙ্গে বল্লেন, “কি কর্‌বো বল? যা' বল্‌বে তাই কর্‌বো। আবার বিপদের আশঙ্কার কথা শুনে' আমার বুদ্ধি সুদ্ধি লোপ পেয়ে যাচ্ছে!”

সুবল বল্লে—“সে অতি সামান্য কথা, আপনি ব্যস্ত হবেন না, রাজকুমারী যেন নিত্য যমুনায় স্নান করেন, দেহে তা' হোলে আর কোন রোগ থাক্‌বে না। সখীদের সাথে যমুনায় যাবেন—খুব বেশী দূর তো আর নয়, এই প্রাসাদ হোতে বের হোলে যে পথ, তার দুই ধারে নাগেশ্বর ও পারুলের গাছ, কত পাখী ডাক্‌ছে,—এই পথ দিয়ে যমুনায় রোজ রোজ যাওয়া আসা কল্লে বেশ স্ফূর্ত্তি পাবেন—আর যমুনা স্নানের ফলে এঁর দেহে অপর কোন দোষ-দৃষ্টি হোতে পার্‌বে না।”

রাজা অত্যন্ত সুখী হোয়ে সম্মত হোলেন। বড়াইকে বল্লেন, তিনি যেন রাইকে যমুনায় নিয়ে যান, সঙ্গে যাবেন গুণচূড়া, ললিতা, বিশাখা, সুদেবী, রঙ্গদেবী প্রভৃতি সখীর দল। রোজ রোজ যমুনায় যেতে পাবেন শুনে রাধার মনেও আনন্দ হ'ল, তিনি ভাব্‌লেন এক মুহূর্ত্তের জন্য সুবল যাঁর মূর্ত্তি সেজে দেখিয়েছিল—যদি তাঁকে দেখ্‌তে পাই, তিনি কে রাধা জানেন না; শুধু যেন স্বপ্ন দেখেছেন, সেই স্বপ্নই যেন সমস্ত জগতের চেয়ে তাঁর কাছে সত্য হোয়ে আছে, তখনও বাঁশী শোনেন নি, তখনও বের হন্‌নি। সুবল কেবল নামটি বলে গেছে; সে নামে কত সুধা সঞ্চিত হোয়ে আছে; সেই রূপের আভাস—যা' স্বপ্নে পাওয়া, কিন্তু সত্যিকার সবার চাইতে প্রিয়তর, শ্রেষ্ঠতর,—তাই দিন রাত মনে পড়্‌ছে; কোথায় তাঁকে পাওয়া যায়, মন যেন দিশেহারা হোয়ে তাই খুঁজ্‌ছে। পাখী এখনও উড়্‌তে শিখেনি, ডানা ঝাপ্‌টাচ্ছে।

রাধার মনকে এই ভাবে প্রস্তুত করে সুবল বৃষভানুপুর হোতে যমুনাপুলিনে কানুর সঙ্গে ছুটে এসে দেখা কল্লেন ; দুইজনে বহুক্ষণ পরস্পরকে বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরে কি কথাবর্ত্তা চল্‌তে লাগ্‌ল ; সে কথা না কাব্য ? তা' অশ্রুতে লিখিত, তা মনের পাতায় পাতায় ছন্দে বদ্ধ, তা' একজন বল্‌ছে, অপরে মনের মাঝে লিখে নিচ্ছে,—যেটুকু বলা হয়নি—তা যেন অপরের মনে আরও ফলিয়ে সুন্দর হোয়ে উঠ্‌ছে ; সেই কাব্যের উপর কতবার প্রেম নিশ্বাস বইছে, তার প্রতিবর্ণ আশার রঙ্গে বিচিত্র হোয়ে উঠ্‌ছে। দুই জনে বহুক্ষণ কি কথা হ'ল—তা' তারাই জানে ; দ্বিতীয় কর্ণ তা' শুনেনি ; এর কিছু পরে বাঁশী সেই কাব্যের গানের ভার নিয়েছিল, কিন্তু আজও বাঁশী রাধা নামে সাধা হয়নি।

রাধা সহচরীদের সঙ্গে যমুনার তীরে যাচ্ছেন; আজ যা' দেখ্‌ছেন, তাতেই যেন শ্যাম-রূপের আভা পড়েছে; আজ প্রাণে বড় স্ফূর্ত্তি, আকাশের মেঘে যে সূর্য্যের কিরণ পড়েছে,—তা যেন সিন্দূর-রাগ; প্রকৃতি নূতন বউটির মত নীল ঘোমটা টেনে সিন্দূর পরে যেন অভিসারে যাচ্ছেন —তাঁর নীল আঁচলের ধারে ধারে সোণা খেল্‌ছে। কার সঙ্গে যে তাঁর দেখা হবে, রাধা বুঝ্‌তে পাচ্ছেন না, কি? প্রাণ ঢল ঢল চোখ ছল্ ছল্, হাওয়ায় গায়ে আনন্দে কাঁটা দিচ্ছে।

রাই চলেছেন, আজ যা দেখ্‌ছেন, সবই যেন নতুন; নতুন সূর্য্যের দীপ্তিতে ফুল-লতা দ্বিগুণ সুন্দর হোয়ে উঠেছে, আজ পারুলফুলগুলি যেন প্রিয় সখীর মত হেসে হেসে তাঁর গায়ে পড়্‌ছে, আজ পাপিয়ার সুরে যেন বিবাহের শুভগীতি-

বাদ্যের সুর শোনা যাচ্ছে। সহচরীরা চলেছেন, আগে বড়াই।

নীপতরুতলে সুবল দাঁড়িয়ে, রাই তাকে দেখে যেন বড় আনন্দ পেলেন; সে রাইকে সঙ্কেতে বলে গেল—"যার রূপ ধ্যান কচ্ছ, যার নাম শুনছ, সে ওই মাধবীলতায় তোমার জন্য অপেক্ষা কচ্ছে।"

তিনি কে? সে রূপ কার? তাঁর নাম শুনেছি কৃষ্ণ, কিন্তু তিনি আমার কে হন? জানি না। কিন্তু হৃদয় উতলা হোয়ে উঠ্‌ছে কেন? তিনি এক মুহূর্ত্তে আমার প্রাণ হোয়েছেন। তাঁকে কোথায় পাব? বাম চোখ্‌ নেচে উঠ্‌ল। রাধার দুটি চোখ্‌ হোতে জল পড়্‌তে লাগ্‌ল। যতই মাধবী-কুঞ্জের দিকে যাচ্ছেন, ততই শরীর রোমাঞ্চিত হচ্ছে, শরীর অবস হয়ে যাচ্ছে, আপনা আপনি হাত জোড় হচ্ছে। রাধা নীল সাড়ীর অাঁচল গলায় দিয়ে কা'কে প্রণাম কর্‌তে কর্‌তে যাচ্ছেন। বড়াই বল্লে, "রাই তুই কেমন হচ্ছিস,

পা' টল্‌ছে কেন ?" রাধা শুন্‌ছেন না ; মাধবী-কুঞ্জে একি মূর্ত্তি ! রাধার দশ ইন্দ্রিয়, কর জোড় হয়ে গেল,—রাধার চোখে ধাঁধা লাগ্‌ল। বড়াই বল্লে, "বুঝেছি রাই, ঐ কানু বসে আছে ওকে দেখ্‌ছ ! ও কে জান রাই ? ওই তোমার সব।" রাধা বড়াইএর পাদ-মূলে মূর্চ্ছিত হোয়ে পড়্‌লেন। বড়াই কৃষ্ণ নাম কানে ব'লে তাঁকে চেতন করলে ; তখন আস্তে আস্তে তুই সখীর কাঁধে তুই হাত রেখে রাই ধীরে ধীরে যেয়ে যমুনায় স্নান কল্লেন—সেই কালো জলে ডুব দিয়ে রাইএর মনে হ'ল "তাঁকে পেয়েছি।"

কিন্তু উনি কে ? লজ্জায় বড়াইকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে পাল্লেন না ; কিন্তু মন উতলা হোয়ে কেবলই সন্ধান খুঁজ্‌তে লাগ্‌ল, উনি কে ? কোথায় থাকেন ? ওঁকে ছাড়া লোকে গেরস্থালী করে কিরূপে ? বড়াই কেন বল্লে "উনি আমার সব ?"

যেদিন চোখের দেখা, সেই দেখাতেই কেনা

বেশ বিনিময়।

বেচা সব। সেই চাউনির কাছে রাধা তার কুল শীল মান সর্ব্বস্ব বিলিয়ে দিলেন। রাধিকা মনে মনে পারুল অপরাজিতা দিয়ে কৃষ্ণের পায়ে পূজা দিলেন—ঘোর অন্যমনস্কের মতো তিনি সহচরী-দের সঙ্গে বাড়ী ফির্‌ছেন; ধূপ ধুনো জ্বালিয়ে মনে মনে যমুনার পথে তাঁর আরতি কর্ত্তে কর্ত্তে যাচ্ছেন, কখনও 'কৃষ্ণায় নমঃ' বলে সেই উপহার দিচ্ছেন, কখনও পঞ্চ প্রদীপ মুখের কাছে ধরে ধরে যেন আরতি করে যাচ্ছেন, কেবলই চোখের জল পড়্‌ছে; ললিতা বল্লে, "তোর কি হয়েছে রাই, থম্‌কে থম্‌কে চলছিস্ যেন বেহুঁসের মতো, আর চোখ গড়িয়ে জল পড়্‌ছে, আর হাতে মুচ্‌ছিস্।"

রাই বল্লেন, "কি যেন হোয়েছে ভাই, আমি নিজেই বুঝ্‌তে পাচ্ছি না কি হোয়েছে।"

বড়াই বিদায় নেওয়ার সময় বলে গেল, "আজ দেখিয়ে দিলুম, সূর্য্য পূজার দিন মিলন করিয়ে দেব।"

কৃষ্ণের যেরূপ সুবল সখা, রাইয়ের সেইরূপ বিশাখা সই। বিশাখা চিত্রাঙ্কণে নিপুনা, সে এর মধ্যে কৃষ্ণের ছবি এঁকে ফেলেছে।

একদিন রাইকে সেই ছবি দেখাল, আর এক দিন বাঁশী বেজে উঠ্‌ল—রাই এস, রাই এস, বলে; এক ব্রজের পর আর এক ব্রজ। রাধাকে কে নিতে এসেছে, সোণার চৌদোলা করে নয় তুর্গম রাস্তা দিয়ে, তার বাপের বাড়ীর রাজ—প্রাসাদ থেকে দূরে—তার স্বামীর ইষ্টকালয় হোতে দূরে, পরিচিত আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে নয়; একা ডাক্‌তে এসেছে, কে এসেছে রাই তাকে চেনেন না, মন তাকে ধারণা করতে পারে না, তবে একলা কি করে তার সঙ্গে যাওয়া যায়? একা কুল-কামিনী কুহু রজনী ঘোর তুর্গম পন্থা, কে ডাক্‌ছে—এই সোণার পুরী হোতে কাঁটা বনে কে ডেকে নিতে এয়েছে, এত সাধের সংসার ছেড়ে ধর্ম্মবিহিত আচরণ ছেড়ে—লোক লজ্জা ছেড়ে, কে তাঁকে ওমন করে যেতে সাধ্‌ছে;

কোথায় নেবে বলে না, সে কে তা বলে না, আমি কেমন কোরে যাব?

শুধু চোখ্ বল্লে, "আমি তাকে চিনি।"

"কোথায় দেখেছ?"

"কি যেন কোথায় যেন দেখেছি।"

কাণ বল্লে—"ওই স্থর চিনি, ওযে সেই বাঁশীর স্থর।"

যেন কত দিনের পরিচিত সেই বাঁশীর স্থর। কিন্তু আগে ত কখনও শুনি নাই, তাই কি এত মিষ্টি?"

ক্ষেপা মেয়ে

পাড়ায় রটে গেল রাধা ক্ষেপে গেছে। বৃষভানু বল্লে, "মা, তোমার কি হোয়েছে ওঝা ডেকে আন্‌ব ?"—"না বাবা তোমার পায়ে পড়ি আমার কিছু হয় নি।" কৃত্তিকা বল্লেন, "তবে ওমন হোয়ে বসে থেকে থেকে চম্‌কে উঠিস্ কেন ? কি দেখে চোখ্ জলে ভরে আসে ? গায়ের আঁচল গায়ে থাকে না, সদাই ধূলোয় লুটোচ্ছে ; বালা চুড়ি কখনো বালিসের নীচে ফেলে রাখিস্, কখনও হাত হোতে খুলে ফেলিস্, কখনও হাত জোড় করে এক ঘণ্টা ধরে মেঘের দিকে চেয়ে কি বলিস্ ? সে দিন ললিতা আমায় দেখালে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে মেঘের দিকে চেয়ে আছিস্ ও চোখ দিয়ে দুধারে জল পড়ছে ; তুই এত কান্নাও জানিস্ ? কি দুঃখ তোর প্রাণে আমাদের বল্ আমরা তা দূর কর্ত্তে পারি কি না চেষ্টা করে দেখি।"

"মা! আমার কিছুই হয় নি," এই বল্‌তে বল্‌তে চোখে জল আস্‌লো। রাধা আঁচলে মুখ চেপে কেঁদে বল্লেন, "মা, তোমাদের কৈফিয়ৎ দিতে দিতে আমার প্রাণ যাবার যো হোয়েছে। তোমরা যদি এখন বিরক্ত কর তবে আমি বিষ খেয়ে মরব।" এই ব'লে রাই আঁচ দিয়ে চোখ মুছ্‌তে মুছ্‌তে নিজ কক্ষে প্রবেশ কল্লেন।

রাজা বল্লেন, "তোমরা ওকে বিরক্ত কোর না, ওর অনিচ্ছায় চিকিৎসা টিকিৎসা স্থরু কল্লে রেগে যেয়ে পীড়া বাড়িয়ে ফেল্‌বে। হয়তো এমনই এমনই শান্ত হোয়ে যেতে পারে।" [illegible]—"থাক্ এখন আর ঘাটানও ভাল নয়। এর পর বুঝিয়ে সুঝিয়ে মতি গতি ফেরাবার চেষ্টা করা যাবে।"

অঙ্গ রাগ

রাধা বিশাখাকে সব বলেছেন,—এখন তার সঙ্গে মিলিবার উপায় কি? "উপায় কি? উপায় কি?—উপায় তো আমরা জানি না— বড়াই বলেছে সূর্য্য পূজার দিন দেখা করাবে। সেই এক উপায়, দ্বিতীয় উপায় ত দেখ্ছি না।"

কালো চুলের রাশি ডান হাতে পিঠ হোতে সরিয়ে এনে মুখের সাম্নে রাখেন, এবং সেই চুল দেখে বিস্ময়ে, পুলকে, গর্ব্বে রাধার ঠোঁট দুটি কাঁপ্‌তে থাকে, সন্ধ্যাকালে রজনী-গন্ধার ডাল যেরূপ হাওয়ার স্পর্শে কাঁপ্‌তে থাকে— ঠোঁট দুটি সেইরূপ কাঁপে, যখন আকাশের গায়ে ঘন-ঘটা করে কালবৈশাখী উদয় হয়, চকিত বিদ্যুৎ খেলে যায়; ঝড়ের বেগে সেই কালো মেঘ-দাম বিদ্যুতের ইঙ্গিত কর্‌তে কর্‌তে কি বল্‌তে যেয়ে অর্দ্ধসমাপ্ত কথা রেখে—দ্রুত

গতিতে দূরে স'রে যায়, তখন রাধা স্বীয় চম্পক-দাম তুল্য আঙ্গুল দিয়ে জোড়হাত করে, জোর ফুল-কলি সৃষ্টি করে—"নমঃ নমঃ" বলে কৃষ্ণকে প্রণাম করেন, তাঁকে যেন সেই মেঘের মধ্যে পেয়ে কি কথা বল্‌তে যান,—কিন্তু বল্‌তে পারেন না, বহুদূর ব'লে, সম্পূর্ণ পরিচয় হয়নি ব'লে কতক জড়ের বিঘ্ন থাকার দরুণ কতক লজ্জায় বলা হয় না। কখনও বাগানে বসে তমাল গাছ খুঁজে তার তলায় দাঁড়িয়েছেন, তার পত্রময় শাখা গা ছুয়েছে তার দুধারে চোখের জল পড়্‌ছে—বিশাখা তখন হাত ধরে তুলে এনে বিছানায় শুয়িয়ে শান্ত কচ্ছেন।

ক্রমে ললিতা চিত্রা প্রভৃতি সকলেই জান্‌ল। বড়াই সূর্য্য পূজার দিন রাধার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের মিলন ঘটালেন। তখন তার পীড়া সেরে গেল; আর সে পাগ্‌লী নেই, এখন তিনি কত যত্ন করে অঙ্গরাগ করেন, কত যত্নে সখীরা চুল বেঁধে দেয়, —সে চোখ আর সাদা, জলপূর্ণ নয়—সদা প্রফুল্ল;

কোন্ বেশটি কৃষ্ণ ভালবেসেছেন—রাধা সেই বেশটি চিনে রাখেন, যে অলঙ্কার যেখানে সাজালে তার মন খুসী হয়,—তাই তিনি প্রাণের বস্তুর মতো ভালবাসেন, চিরুণী ও মুকুর নিয়ে কত টানাটানি। এক দিন বিশাখা বল্লে, "রাই সেই দিন আর এই একদিন। তখন এমন যোগিনী হোয়ে গেছিলি কেন; সেই অভিনয় দেখার পর হোতে সূর্য্য পূজার দিন পর্য্যন্ত তুই গয়না পর্‌তিস্ না, নীলাম্বরী ছেড়ে যোগিনীর লাল সাড়ী পড়্‌তিস্, আয়নায় একদিন মুখ দেখতিস্ না, সেই কৃষ্ণকে তখনও ভাবতিস্, এখন না হয় পেয়েছিস্, কিন্তু ভাবের এতটা পরিবর্ত্তন কিসে হোল তা বুঝ্‌তে পাচ্ছিনা।"

রাই বল্লে—"এতদিন পাবার চেষ্টায় ছিলাম আর কিছু খেয়ালে ছিল না, না পাওয়ায় কষ্ট ছিল; এখন তো তা নেই! এ দেহ যেদিন তিনি নিয়েছেন, সেদিন তাঁর জিনিষ ব'লে একে আদর কর্‌তে শিখেছি, তাঁর কাছে অভিসারে যাব, তাঁর

জিনিষ তাঁকে দিব, তিনি যে ভাবে ভালবাস্‌বেন তাই ত দিব। যতদিন আমার বলে' ধারণা ছিল, ততদিন উদাসিনী ছিলুম, এখন কৃষ্ণের জিনিষকে তেমন তো আর তুচ্ছ করতে পারি না।"

রাই এই বল্‌ছিলেন, এমন সময় ললিতা এক বণিক-সীমন্তিনীকে কোত্থেকে ধরে এনে তার মহলে উপস্থিত কল্লে ; তার কাঁখে একটা চুপ্‌ড়ি— তাতে সিন্দুর, অগুরু, চুয়া, চন্দন প্রভৃতি ; বণিক-বধূ বল্লে, "রাজকুমারী, কোন জিনিষ কিন্‌বে ?" রাধা খুব উৎসাহী হোয়ে উঠ্‌লেন—অগুরুর গন্ধে কৃষ্ণ সুখী হন, 'দেখি দেখি' ব'লে তিনি সেই চুপড়িটির দিকে ঝুঁকে পড়লেন। যা দেখেন, তাই কিনে রাখেন। সখীরা ঈষৎ হেসে সরে গেল ; রাই চোখ নীচু করে জিনিষ দেখ্‌ছিলেন, তাদের দেখতে পান নি ; কৃষ্ণ প্রেমে-চক্ষু ছল ছল ; কোন জিনিষে সাজ্‌লে তিনি খুসী হবেন, ভাব্‌ছেন আর চোখ বেয়ে জল পড়্‌ছে, এক হাতে তা মুচ্‌ছেন ; আর গদ গদ কণ্ঠে বণিক-পত্নীকে কত কথা শুধোচ্ছেন, তার পর কত দাম

পড়্‌বে, জিজ্ঞাসা কল্লেন। বণিক-পত্নীর চক্ষুও সজল। সে বল্লে, “আমি বুঝি দামের জন্য বোঝা কাঁখে করে এতদূর এসেছি?” চম্‌কে উঠে রাই তার মুখের দিকে তাকালেন। তখন সেই দুই সজল চোখ আর দুইটী সজল চোখ দেখ্‌তে পেল; তখন আনন্দ আনন্দে মিশে গেল; যে বিনিময়ের পণ যথাসর্ব্বস্ব, চোখে চোখে সে বিনিময় হোয়ে গেল; বণিক-বধূর ছলনা ভেঙ্গে গেল। কৃষ্ণ জোর হাত করে বল্লেন, “দাম কি পাব না”? তখন অতি আদরে রাধার শুভ্র সুন্দর কণ্ঠ শ্যাম-লতার মতো কালো নিজ বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরে তার কম্পিত অধর যুগলে একটি চুম্বন অঙ্কিত ক’রে দিলেন; সেই চুম্বনে রাধার সমস্ত দেহের কলুষ দূর হ’ল—তিনি যেন গঙ্গাজলে স্নান করে উঠ্‌লেন। কৃষ্ণের বাহুপাশ মুক্ত হোয়ে রাই যেমনি দাঁড়িয়েছেন—তখনও তাঁর চোখের আবেশ ঘোচেনি, তখনও তিনি যেন কোন উর্দ্ধ-লোকেই আছেন—জড়জগতে নামেন নাই—এমন

সময় রঙ্গদেবী উতলা হোয়ে সেই ঘরে ঢুকে বল্লে, "বণিক-বধূ চুপড়ী কাঁখে করে বিদ্যুৎ-বেগে চলে গেল, সে তো আবার দাম নিতে আস্‌বে ?"

রাধা স্মিত-মুখে বল্লেন, "সে দাম পেয়েছে।" বিশাখা ও চিত্রা সেই সময় এসে পড়েছিল—তারা শুনে হেসে উঠ্‌ল। রঙ্গদেবী ভাব্‌লে এরা হাস্‌ছে কেন ?

নাপিতের বউ

কয়েক দিন চলে গেছে—আজ রাত্রে অভি-
সারের পালা ; রাধাকে সখীরা সাজ-গোজ করে
দিচ্ছে, কিন্তু নখগুলি কাটা হয় নি, পায়ে আল্তা
পরাণ হয় নি ; এমন সময়ে নাপ্তানি এসে উপ-
স্থিত ; বুড়ী তার এক ছুঁড়ী নাত্নীকে পাঠিয়ে
দিয়েছে, সে এত বড় ঘোমটা টেনে নখরঞ্জিনী
দিয়ে রাইএর নখ কাটতে বসে গেল। এর মধ্যে
সখীরা পাশের ঘরে গিয়ে ফুলের মশারি তৈরী
করতে উঠে পড়ে লেগে গেছে। সে তো এক
জনের কর্ম্ম নয় ; ঘরটার মধ্যে একশ' দুইশ'
সূতো ছোট ছোট ফুলের মালা, সবগুলি সাদা ;
ছাতটায়ও ছোট ছোট ফুলের গাঁথুনি, তার
তিনটের পর একটা একটা লাল ফুল; পাড়গুলি
লাল ফুলের, পাঁপড়িতে নীল ফুলের বুননি
দিয়ে তৈরী হচ্ছে ; সুদেবী এক পাড় টেনে

ধর্‌ছে, খোলা চুলের আড়ালে রঙ্গদেবী চোখ্‌ ছুটি পড়ে যেন জালে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে —সুদেবী বল্‌ছে :—"চুল সরিয়ে নে, আমার আঙ্গুঁলে ছুঁচ বিঁধ্‌ছে দেখ্‌তে পাচ্ছিনা।" বিশাখা হেসে হেসে মালা গাঁথ্‌ছে, গুণচূড়া সাজি হোতে ফুলের জোগান দিচ্ছে; চম্পক লতিকা কোমরে নীল সাড়ী বেঁধে বন-লতা দিয়ে ফুল গেঁথে মশারির দড়ী তৈরী কচ্ছে; এঘরে ঘটা করে মশারি প্রস্তুত হচ্ছে আর ওঘরে রাই সাজ-গোজ করে নাপ্‌তানীর হাতে আল্‌তা পরছেন। বড় কোমল স্পর্শ, রাধা সেই স্পর্শে যেন ভুলে যাচ্ছেন যে আল্‌তা পর্‌ছেন; মনে হচ্ছে কে যেন তাঁর মান ভাঙ্গাবার জন্য পায়ে হাত দিচ্ছে; ঘোমটা এসে এত ঘন ঘন তাঁর পা ছুয়ে যাচ্ছে কেন? "একি কচ্ছ? আলতা পরাতে এত দেরী হচ্ছে কেন?" এই বলে নিজে পায়ের দিকে চেয়ে দেখেন; আলতা দিয়ে নাপতানী তার পায়ের ধারে ধারে কৃষ্ণ নাম লিখ্‌ছে।

রাধা চম্‌কে উঠে অবগুণ্ঠনবতীর ঘোমটা খুলে মুখ দেখ্‌লেন, তখন দুইটি সজল চোখের মিনতি-পূর্ণ দৃষ্টিতে যেন তাঁর মনে সুধা বৃষ্টি হ'ল। নাপতানীর ছল্‌ ছেড়ে দিয়ে কৃষ্ণ বল্লেন, "তোমার অভিসারের পূর্ব্বেই আমার অভিসার হ'ল, এ দুইটি কোমল পায়ে কেমন করে পথের কাঁটা কাঁকর ভেঙ্গে অভিসারে যাবে রাই ?" কানুর চোখ দিয়ে জল পড়্‌ল, রাই বল্লেন, "তোমার জন্য যেন জন্মে জন্মে পথের কাঁটা ও কাঁকড় ভেঙ্গে পথে চলি, আমি বাসনার রাজপথে যেতে চাই না, এমন ভাগ্যি যেন হয় যে তোমার পথের কষ্ট আমার সুখ বলে মনে হয়।" দুজনের চোখের জল তখনও শুকায় নাই, এমন সময় বীণা-ধ্বনির মত মিষ্ট স্বরে বিশাখা বল্লে, "নাপতানীকে পেলে আর রাইএর আমাদের মনেই লাগে না।"

বেশ পরিবর্ত্তন

রাই শ্বশুর-বাড়ী এসেছেন ; রান্না ঘরে বসে রাঁধ্‌ছেন, কেবলই কৃষ্ণকথা মনে পড়্‌ছে, আর কাঁদ্‌ছেন। কেউ ঘরে ঢুক্‌লে বলেন, "কাঁচা কাঠের ধোঁয়ায় চোখ ছুটি গেল।" শুধু শুধু কান্নার অর্থ কেহ বুঝল না ; কেউ যদি কৃষ্ণের নাম করে অমনই রাই যেয়ে তার পায়ে ধরেন ; "এত ভক্তি কেন গো বউ ?" বলে যখন সেই ব্যক্তি তাঁকে আশীষ করে ধ'রে তোলেন ; রাই বলেন। "এই আশীর্ব্বাদ পাবার জন্য।" কতরূপে ঢাকার চেষ্টা তবু তো ছাই সে কথা ঢাকা পড়ে না। সখীরা এসে কত কথা বলে যায় ; রাই কাকে কি বল্‌বেন ? তিনি জানেন যত দিন ঘরে বসে তাঁকে ভজনা চল্‌বে, ততদিন ঘর, তা যে দিন না চল্‌বে সেদিন আকাশের নীচে পৃথিবীটা পড়ে আছে, যেটা বিপথ তাই ধোরে গেলেই

তাঁকে পাব। এই ভাব্‌ছেন এমন সময় রোদে তেতে পুড়ে, চোখের জল হাত দিয়ে মুছ্‌তে মুছ্‌তে সুবল সখা এসে দেখা দিলেন। রাই আস্তে আস্তে উঠে বল্লেন, "কি হয়েছে? তোমার সখার তো কুশল?" "ওগো না গো না, তাই তো তোমায় বল্‌তে এসেছি; যমুনার পাড়ে কদম্ববন আছে না? তার কাছে একটা চাঁপা গাছ দেখ নি? অজচ্ছর ফুল ফোটে, এখন কিনা ভাদ্র মাস —বড্ড ফুল হোয়েছে।"

"তাই বুঝি আমার জন্য কানু কুড়ুচ্ছেন? তা এটা আর মন্দ খবর কি?"

"আহা তা নয়, শেষ পর্য্যন্ত শুনে নেও না। সেই চাঁপা ফুল দেখে কানু বলে উঠ্‌লেন— আমার রাধার বর্ণ কে ওই ফুলের গায়ে মেখে দিয়েছে? আমার রাধা কোথায়?"

এই ব'লে পাগলের মতো সেই ফুলগুলির দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে আমার কাঁধে ঢলে পর্‌লেন; তার পর শাল পাতার খুড়ী তৈরি করে যমুনার জল

নিয়ে এসে কত চোখে মুখে ঢাল্‌লুম, কিছুতেই কানুর জ্ঞান হ'ল না।"

এই বলে সুবল কাঁদ্‌তে লাগল। রাই বল্লেন, "আমি যাচ্ছি।"

"তুমি কি করে যাবে, এত বৃষভানুপুরী নয়। ওই ঘরে তোমার শ্বাশুড়ী ও ননদী ঘুমোচ্ছেন, এখনই জেগে উঠে যদি তোমায় খোঁজেন।"

"যদি খোঁজেন, খুঁজবেন, নদীর পাড়ে গিয়ে দেখ্‌বেন আমি কোথায় আছি।, তবে যদি নেহাৎ তুমি বাইরের কথা তুল্‌বে—এখন আমার সে সকল কথা ভোলবার সময় নয়—তবে দাও তোমার ধরা চূড়াটা, আর তোমার ওই চূড়ার উপরকার বড় ফুলের মালাটা।—আমার ওই নীল ডুরে শাড়ী খানা শুকোচ্ছে—ওই খানা পরে বসে রান্না কর। তুমি কত অভিনয়ই দেখিয়েছ। আজ এখানে বসে রাধার অভিনয়টা কর্‌তে হবে।"

রাধা সেই ধরা চূড়া পর্‌লেন, কণ্ঠে চার লহর বড় বন ফুলের মালা ঝুলিয়ে দিলেন। তার পর

সুবলের পাঁচন-বাড়িটা তার হাত হতে নিয়ে সেই দুপুর বেলায় বের হয়ে পড়্লেন।

মিলন

কৃষ্ণ-দরশনে যাচ্ছেন, "তাঁকে যেয়ে কেমন দেখ্‌ব। তিনি আমারই জন্য জ্ঞান হারিয়েছেন, কালিদয়ের জলে পুতুনার বিষে যার কিছু হয়নি, তিনি চাঁপা ফুল দেখে আমায় মনে ক'রে অজ্ঞান হোয়েছেন। আমার মত ভাগ্যবতী কে?" রাধার দুই চোখে অবিরল জল পড়্‌ছে, তিনি কোন্ পথে যাচ্ছেন,—পথ দেখে যাচ্ছেন না। দুপুর রোদের তপ্ত পথের বালুতে পা দগ্ধ হোচ্ছে; কখনও তো হাটা অভ্যাস নেই, রাধা ভাব্‌ছেন,—এ আমার পুষ্পের পথ। কানুকে কি সংজ্ঞা দিতে পার্‌ব না? আমার বিরহে যে জ্ঞান হারিয়েছে, আমার সঙ্গে মিলনে কি সে জ্ঞান পাবে না?"

রাই গিয়ে দেখেন, যমুনার কালো জলের পাড়ে চাঁপা ফুল অজস্র প'ড়ে আছে, সেই চাঁপাফুল বুকে রেখে, চোখ্ বুজে কৃষ্ণ পড়ে

আছেন ; ঠোঁট দুখানি শুক্‌নো; যেন প্রাণে পিপাসা জেগেছে, মেটে নাই, তাই দুচোখের জল গড়িয়ে পড়্‌ছিল—সেই অশ্রু চোখের কাছে শুকিয়ে আছে। ঠোঁট দুখানি কি মধুর!—চূড়া হোতে গুঞ্জা ফল পড়ে গেছে, তবু চূড়াটি কি মধুর! ময়ূরের পুচ্ছ জগতের সমস্ত বর্ণ সম্পদ নিয়ে—কানু কখন আবার নিজকে তা' দিয়ে সাজাবেন—তার জন্য যেন প্রতীক্ষা কচ্ছে। রাই চাঁপা ফুলটি ফেলে দিয়ে কানুর বুকে মাথা রেখে অশ্রু ফেল্‌তে ফেল্‌তে বল্‌তে লাগ্‌লেন, "ওঠ আমার চোখের মণি তোমার জন্য কত যোগী ঋষি তপস্যা কর্‌ছেন। ক্ষীরোদে যেয়ে লক্ষ্মীর কাছে ঘুমিও, এই বৃন্দাবনে আমি তোমায় ঘুমোতে দেব না, আমরা এখানে জাগ্‌ব বলে এসেছি, তোমার সঙ্গে মিলনের এই জাগরণ কতটুকু, তার মধ্যে আবার ঘুম!"

রাধার চোখের জলের স্পর্শ, তার কর-স্পর্শ পেয়ে কৃষ্ণ জেগে উঠে বল্লেন, "সুবল আর

কেঁদনা, আমার রাধাকে এনে দাও, তুমিই তো প্রথম এনে দেখিয়েছিলে।"

তখন সুমধুর কণ্ঠে হেসে উঠে, চূড়াটা খুলে ফেলে বনমালা গা হোতে ঝেড়ে ফেলে রাই বল্লেন, "আমি বুঝি তোমার সুবল ?"—কৃষ্ণ চম্‌কে উঠে চিন্‌তে পেরে রাধাকে বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরে বল্লেন, "তোমায় এই বনে পেলুম, বড় ভাগ্যি আমার।"